ছলনার ছন্দ

টেলিফোন তুলে নিয়ে ব্যোমকেশ বলল— 'হ্যালো!'

ইন্সপেক্টর রাখালবাবুর গলা শোনা গেল— 'ব্যোমকেশদা, আমি রাখাল। নেতাজী হাসপাতাল থেকে কথা বলছি। একবার আসবেন?'

'কি ব্যাপার?'

'খুনের চেষ্টা। একটা লোককে কেউ গুলি করে মারবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মারতে পারেনি। আহত লোকটাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। সে এক বিচিত্র গল্প বলছে।'

'তাই নাকি? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

কেয়াতলায় ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে নেতাজী হাসপাতাল বেশি দূর নয়। আধ ঘণ্টা পরে বিকেল আন্দাজ পাঁচটার সময় ব্যোমকেশ সেখানে পৌঁছে দেখল, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে দারোগা রাখাল সরকার দাঁড়িয়ে আছেন।

এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি আরো কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটন করলেন। আহত লোকটির নাম গঙ্গাপদ চৌধুরী, ভদ্রশ্রেণীর লোক। ফ্রেজার রোড থেকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়েছে, সেই রাস্তায় একটা বাড়ির দোতলার ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। বাড়ির ঠিকে চাকর বেলা তিনটের সময় কাজ করতে এসে গঙ্গাপদকে আবিষ্কার করে। তারপর হাসপাতাল পুলিস ইত্যাদি। গঙ্গাপদর জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু প্রচুর রক্তপাতের ফলে এখনো ভারি দুর্বল।

গঙ্গাপদ আজ বিকেলবেলা তার দোতলার ঘরে রাস্তার দিকে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ সামনের দিক থেকে বন্দুকের গুলি এসে তার চুলের মধ্যে দিয়ে লাঙল চষে চলে যায়। খুলির ওপর গভীর টানা দাগ পড়েছে, কিন্তু গুলি খুলি ফুটো করে ভিতরে ঢুকতে পারেনি, হাড়ের ওপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেছে।

বন্দুকের গুলিটা ঘরের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে, দেখে মনে হলো পিস্তল কিংবা রিভলবারের গুলি। পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছে।

এবার চলুন গঙ্গাপদর বয়ান শুনবেন। তাকে খানিকটা রক্ত দেওয়া হয়েছে, এতক্ষণে সে বোধ হয় বেশ চনমনে হয়েছে।

গঙ্গাপদ চৌধুরী একটি ছোট ঘরে সঙ্কীর্ণ লোহার খাটের ওপর শুয়ে ছিল। মাথার ওপর পাগড়ির মত ব্যান্ডেজ, তার নীচে শীর্ণ লম্বাটে ধরনের একটি মুখ। মুখের রঙ বোধ করি রক্তপাতের ফলে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। ভাবভঙ্গীতে ভালমানুষীর ছাপ।

ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু খাটের দু'পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। গঙ্গাপদ একবার এর

দিকে একবার ওর দিকে তাকাল ; তার পাংশু অধরে একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। লোকটি মৃত্যুর সিংদরজা থেকে ফিরে এসেছে, কিন্তু তার মুখে চোখে ত্রাসের কোনো চিহ্ন নেই।

রাখালবাবু বললেন— 'এঁর নাম ব্যোমকেশ বক্সী। ইনি আপনার গল্প শুনতে এসেছেন।'

গঙ্গাপদর চক্ষু হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল, সে ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করলে ব্যোমকেশ তার বুকে হাত রেখে আবার শুইয়ে দিল, বলল— 'উঠবেন না, শুয়ে থাকুন।'

গঙ্গাপদ বুকের ওপর দু'হাত জোড় করে সংহত সুরে বলল— 'আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবু! কী সৌভাগ্য। আমার কলকাতা আসা সার্থক হলো।'

রাখালবাবু বললেন— 'আপনি যদি শরীরে যথেষ্ট বল পেয়ে থাকেন তাহলে ব্যোমকেশবাবুকে আপনার গল্প শোনান। আর যদি এখনো দুর্বল মনে হয় তাহলে থাক, আমরা পরে আবার আসব।'

গঙ্গাপদ বলল— 'না না, আমার আর কোনো দুর্বলতা নেই। খুব খানিকটা রক্ত নাড়ির মধ্যে ঠুসে দিয়েছে কিনা।' বলে হেসে উঠল।

'তাহলে বলুন।'

খাটের পাশে টিপাইয়ের ওপর এক গ্লাস জল রাখা ছিল, গঙ্গাপদ বালিশের ওপর উঁচু হয়ে শুয়ে এক চুমুক জল খেলো, তারপর হাসি-হাসি মুখে গল্প বলতে আরম্ভ করল :

আমার নাম কিন্তু গঙ্গাপদ চৌধুরী নয়, অশোক মাইতি। কলকাতায় এসে আমি কেমন করে গঙ্গাপদ চৌধুরী বনে গেলাম সে ভারি মজার গল্প। বলি শুনুন।

আমার বাড়ি মীরাটে। সিপাহী যুদ্ধেরও আগে আমার পূর্বপুরুষ মীরাটে গিঁয়ে বাসা বেঁধেছিলেন। সেই থেকে আমরা মীরাটের বাসিন্দা, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক খুব বেশি নেই।

আমি মীরাটে সামান্য চাকরি করি। বাড়িতে বিধবা মা আছেন ; আর একটি আইবুড়ো বোন। আমি বিয়ে করেছিলাম কিন্তু বছর পাঁচেক আগে বিপত্নীক হয়েছি। আর বিয়ে করিনি। বোনটাকে পাত্রস্থ না করা পর্যন্ত—

কিন্তু সে যাক। অফিসে এক মাস ছুটি পাওনা হয়েছিল, ভাবলাম কলকাতা বেড়িয়ে আসি। কলকাতায় আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই ; আমি ছেলেবেলায় একবার কলকাতায় এসেছিলাম, তারপর আর আসিনি। ভাবলাম স্বদেশ দেখাও হবে, আর সেই সঙ্গে বোনটার জন্যে যদি একটি পাত্র পাই—

হাওড়ায় এসে নামলাম। মীরাট থেকে এক হিন্দুস্থানী ধর্মশালার ঠিকানা এনেছিলাম, ঠিক ছিল সেখানেই উঠব। ট্রেন থেকে নেমে ফটকের দিকে চলেছি, দেখি একটা দাড়িওয়ালা লোক আমার পাশে পাশে চলেছে, আর ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে আমার পানে তাকাচ্ছে। একবার মনে হলো কিছু বলবে, কিন্তু মুখ খুলে কিছু না বলে আবার মুখ বন্ধ করল। আমি ভাবলাম, এ আবার কে ? হয়তো হোটেলের দালাল।

ধর্মশালায় পৌঁছে কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেলাম। সেখানে একটি কুঠুরিও খালি নেই, সব ভর্তি, এখন হোটেলে যেতে হয় ; কিন্তু হোটেলে অনেক খরচ, অত খরচ আমার পোষাবে না। কি করব ভাবছি, এমন সময় সেই দাড়িওয়ালা লোকটি এসে উপস্থিত। চোখে নীল চশমা লাগিয়েছে। বলল— 'জায়গা পেলেন না ?'

বললাম—'না। আপনি কে ?'

সে বলল— 'আমার নাম গঙ্গাপদ চৌধুরী। আপনি কোথা থেকে আসছেন ?'

বললাম— 'মীরাট থেকে। আমার নাম অশোক মাইতি। আপনি কি হোটেলের এজেন্ট ?'

সে বলল— 'না। হাওড়া স্টেশনে আপনাকে দেখেছিলাম, দেখেই চমক লেগেছিল। কেন চমক লেগেছিল সে কথা পরে বলছি। এখন বলুন দেখি, কলকাতায় কি আপনার থাকবার জায়গা নেই ?'

বললাম— 'থাকলে কি ধর্মশালায় আসি ? কিন্তু এখানেও দেখছি জায়গা নেই। হোটেলের খরচ দিতে পারব না। তাই ভাবছি কী করি।'

গঙ্গাপদ বলল— 'দেখুন, আমার একটা প্রস্তাব আছে। কলকাতায় আমি থাকি, দক্ষিণ কলকাতায় আমার বাসা আছে। আমি মাসখানেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, বাসাটা খালি পড়ে থাকবে। তা আপনি যদি আমার বাসায় থাকেন আপনারও সুবিধে আমারও সুবিধে। আমার একটা ঠিকে চাকর আছে, সে আপনার দেখাশোনা করবে, কোনো কষ্ট হবে না।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম— 'আমার মত একজন অচেনা লোকের হাতে আপনি বাসা ছেড়ে দেবেন !'

গঙ্গাপদ একটু হেসে বলল— 'তাহলে চমক লাগার কথাটা বলি। স্টেশনে আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল আপনি আমার ভাই দুর্গাপদ। তারপর ভুল বুঝতে পারলাম। দুর্গাপদ দু' বছর আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, বোধ হয় সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে তার চেহারার খুব মিল আছে। তাই—মানে—আপনার প্রতি আমার একটু—ইয়ে—। আপনি যদি আমার বাসায় থাকেন আমি খুব নিশ্চিন্ত হব।'

আমার ভাগ্যে এমন যোগাযোগ ঘটবে স্বপ্নেও ভাবিনি। খুশি হয়ে রাজী হয়ে গেলাম।

গঙ্গাপদ আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে তার বাসায় নিয়ে গেল। ছোট রাস্তায় ছোট বাড়ির দোতলায় একটি মাঝারি গোছের ঘর, ঘরে তক্তপোশের ওপর বিছানা, দেয়ালে আলমারি, দু' একটা বাক্স সুটকেস। আর কিছু নেই।

হিন্দুস্থানী চাকরটা উপস্থিত ছিল। তার নাম রামচতুর। গঙ্গাপদ তাকে পয়সা দিল দোকান থেকে চা জলখাবার আনতে। সে চলে গেলে গঙ্গাপদ রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিয়ে তক্তপোশে এসে বসল, বলল— 'বসুন, আপনার সঙ্গে আরো কিছু কথা আছে।'

আমিও তক্তপোশে বসলাম। গঙ্গাপদ বলল— 'আমার বাড়িওয়ালা কাশীপুরে থাকে, লোকটা ভাল নয়। সে যদি জানতে পারে আমি অন্য কাউকে ঘরে বসিয়ে একমাসের জন্য বাইরে গেছি তাহলে হাঙ্গামা বাধাতে পারে। তাই আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। যদি কেউ আপনার নাম জিজ্ঞেস করে, আপনি বলবেন— গঙ্গাপদ চৌধুরী। লোকে ভাববে আমি দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি।'

শুনে আমার খুব মজা লাগল, বললাম— 'বেশ তো, এ আর বেশি কথা কি !'

তারপর রামচতুর চা জলখাবার নিয়ে এল। গঙ্গাপদ আমাকে জলযোগ করিয়ে উঠে পড়ল, বলল— 'আচ্ছা, এবার তাহলে আমি চলি। আমার জিনিসপত্র ঘরে রইল। নিশ্চিন্ত মনে বাস করুন। নমস্কার।'

দোর পর্যন্ত গিয়ে গঙ্গাপদ ফিরে এল, বলল— 'একটা কথা বলা হয়নি। যখন ঘরে থাকবেন, মাঝে মাঝে জানলা খুলে রাস্তার দিকে তাকাবেন ; লক্ষ্য করবেন রাস্তা দিয়ে লাল কোট পরা কোনো লোক যায় কিনা। যদি দেখতে পান, তারিখ আর সময়টা লিখে রাখবেন। কেমন ?'

'আচ্ছা।'

গঙ্গাপদ চলে গেল। আমার সন্দেহ হলো তার মাথায় ছিট আছে। কিন্তু থাকুক ছিট, লোকটা ভাল। আমি বেশ আরামে রইলাম। রামচতুর আমার সেবা করে। আমি সকাল বিকেল এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই, দুপুরে আর রাত্রে ঘরে থাকি। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, রাস্তা দিয়ে লাল কোট পরা কেউ যাচ্ছে কিনা। লাল কোট পরে কলকাতার রাস্তায় কেউ ঘুরে বেড়াবে এ যেন ভাবাই যায় না। তবু গঙ্গাপদ যখন বলেছে, হবেও বা।

হপ্তাখানেক বেশ আরামে কেটে গেল।

আজ সকালে খবরের কাগজের অফিসে গেছলাম বোনের পাত্র সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞাপন দিতে। ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে তক্তপোশে শুলাম। রামচতুর চলে গেল।

ঘুম ভাঙল আন্দাজ পৌনে তিনটের সময়। বিছানা থেকে উঠে জানলা খুলে দিলাম। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছি, হঠাৎ মাথাটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠল, উল্‌টে মেঝের ওপর পড়ে গেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই, অসহ্য যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

হাসপাতালে জ্ঞান হলো। মাথায় পাগড়ি বেঁধে শুয়ে আছি। কে নাকি আমার মাথা লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়েছিল, বন্দুকের গুলি আমার খুলির ওপর আঁচড় কেটে চলে গেছে। — 'কী ব্যাপার বলুন দেখি ব্যোমকেশবাবু?'

'সেটা বুঝতে সময় লাগবে। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ রাখালবাবু ব্যোমকেশের বাড়িতে এলেন। ব্যোমকেশ তার অফিস ঘরে বসে অলসভাবে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ছিল, রাখালবাবুকে একটি সিগারেট দিয়ে বলল— 'নতুন খবর কিছু আছে নাকি?'

রাখালবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন— 'রামচতুর পালিয়েছে।'

'রামচতুর! ও—সেই চাকরটা।'

'হ্যাঁ। কাল বিকেলবেলা পুলিসকে খবর দিয়ে সেই যে গা-ঢাকা দিয়েছে তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সত্যিই রাম-চতুর। পুলিসের হাঙ্গামায় থাকতে চায় না। এতক্ষণ বোধ হয় বেহার প্রদেশে ফিরে গিয়ে ভুট্টা পুড়িয়ে খাচ্ছে। আর কিছু?'

'বাড়িওয়ালাকে কাশীপুর থেকে খুঁজে বার করেছি। আজ সকালে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। অশোক মাইতিকে দেখে বলল, এই গঙ্গাপদ চৌধুরী; তারপর গলার আওয়াজ শুনে বলল, না গঙ্গাপদ নয়, কিন্তু চেহারার খুব মিল আছে।'

এই পর্যন্ত শুনে ব্যোমকেশ বলল— 'গঙ্গাপদ চৌধুরীর সঙ্গে অশোক মাইতির চেহারার মিল আছে?'

রাখালবাবু বললেন— 'হ্যাঁ, গঙ্গাপদ বলেছিল তার ভায়ের সঙ্গে মিল আছে, গঙ্গাপদ এবং তার ভায়ের চেহারা যদি এক রকম হয়—'

'গঙ্গাপদর দাড়িটা মেকি মনে হচ্ছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অশোক মাইতিকে এনে নিজের বাসায় তুলল কেন? নিজের নামটাই বা তাকে দান করল কেন? আসল কারণটা কী?'

ব্যোমকেশ কি-একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর অলস কণ্ঠে বলল— 'চিন্তার কথা

বটে। আসল গঙ্গাপদ বোধ করি এখনো নিরুদ্দেশ।'

'হ্যাঁ। তার ঘরের আলমারি থেকে কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় সে কলকাতায় এক লোহার কারখানায় কাজ করে, সম্প্রতি একমাসের ছুটি নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।'

'গুলিটা কোথা থেকে এসেছিল জানা গেছে?'

'সামনের বাড়ি থেকে। রাস্তার ওপারে একটা পোড়ো বাড়ি কিছুদিন থেকে খালি পড়ে আছে, তার দোতলার জানলা থেকে কেউ গুলি ছুঁড়েছিল। পোড়ো বাড়ির ঘরের মধ্যে কয়েকটা তাজা আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, কিন্তু কার আঙুলের ছাপ তা সনাক্ত করার উপায় নেই।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সংবাদগুলিকে একত্র করে মনের মধ্যে রোমন্থন করল, তারপর বলল— 'রহস্যটা কিছু পরিষ্কার হলো?'

রাখালবাবু সিগারেটে দুটো লম্বা টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশ-ট্রের ওপর নিবিয়ে দিলেন, আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন— 'গঙ্গাপদ চৌধুরীর দাড়ি যে নকল দাড়ি তার একটা জোরালো প্রমাণ, তার বাড়িওয়ালা তার মুখে কখনো দাড়ি-গোঁফ দেখেনি ; আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, গঙ্গাপদ ছদ্মবেশে বেড়ায় কেন। একটা কারণ এই হতে পারে যে, সে ছদ্মবেশে কোনো গুরুতর অপরাধ করতে চায়। তারপর একদিন হাওড়া স্টেশনে সে অশোক মাইতিকে দেখতে পায়, নিজের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে তাকে ভুলিয়ে নিজের বাসায় এনে বসায়, তারপর নিজে গা-ঢাকা দেয়। হয়তো সে নিজেই সামনের বাড়ি থেকে অশোককে খুন করার চেষ্টা করেছিল, যাতে লোকে মনে করে যে, গঙ্গাপদই মরেছে। হয়তো এইভাবে সে জীবনবীমার টাকা সংগ্রহ করতে চেয়েছিল। যাই হোক, এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, তার পরিচয় এবং বর্তমান ঠিকানা আমরা জানি না ; সে অশোক মাইতিকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল কিনা তা নিশ্চয়ভাবে জানি না, কারণ তার কাগজপত্রের মধ্যে জীবনবীমার পলিসি পাওয়া যায়নি। এখন কর্তব্য কি?'

ব্যোমকেশ একটু ভেবে বলল— 'মীরাটে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে?'

রাখালবাবু বললেন— 'অশোক মাইতিকে দিয়ে মীরাটে তার মা'র নামে টেলিগ্রাম করিয়েছি। এখনো জবাব আসেনি। কেন, আপনি কি অশোক মাইতিকে সন্দেহ করেন?'

'অশোক মাইতিকে বড় বেশি ভাল মানুষ বলে মনে হয়। সে হয়তো সত্যি কথাই বলছে, কিন্তু তার কোনো সমর্থন নেই। রামচতুর সমর্থন করতে পারত, কিন্তু সে পালিয়েছে।—যাক, গঙ্গাপদ কোথায় কাজ করে?'

'কলকাতার উপকণ্ঠে একটা লোহার কারখানা আছে সেইখানে।' রাখালবাবু পকেট থেকে নোটবুক বার করে পড়লেন— 'Scrap Iron & Steel Factory Ltd.'

'সেখানে খোঁজ নিলে কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।'

'সেখানে যাব বলেই বেরিয়েছি। আপনি আসবেন সঙ্গে?'

'যাব। বাড়িতে বেকার বসে থাকার চেয়ে ঘুরে বেড়ালে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।'

কলকাতার দক্ষিণ সীমানার বাইরে বিঘে দুই জমির ওপর লোহার কারখানা। জমির এধারে ওধারে কয়েকটা করোগেট টিনের উঁচু ছাউনি, তাদের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে স্তূপীকৃত জং-ধরা ঝুনো পুরনো লোহা। চারিদিকে কর্মীদের তৎপরতা দেখে মনে হয় কারখানার কাজ চালু আছে। ফটকের পাশে একটি ছোট পাকা বাড়ি, এটি কোম্পানির অফিস।

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু যখন কারখানায় পৌঁছুলেন তখন কারখানার ম্যানেজার

রতনলাল কাপড়িয়া অফিস ঘরে ছিলেন। রতনলাল মাড়োয়ারী হলেও তিন পুরুষ ধরে বাংলাদেশে আছেন, প্রায় বাঙালী হয়ে গেছেন ; পরিষ্কার বাংলা বলেন। দু'জনকে সামনে বসিয়ে পান সিগারেট দিলেন, বললেন— 'হুকুম করুন।'

রাখালবাবু একবার ব্যোমকেশের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন আরম্ভ করলেন, ব্যোমকেশ চুপ করে বসে শুনতে লাগল।—

'গঙ্গাপদ চৌধুরী এখানে কাজ করে ?'

'হ্যাঁ। উপস্থিত ছুটিতে আছে।'

'সে কী কাজ করে ?'

'ইলেকট্রিক ফার্নেসের মেল্টার।'

'সে কাকে বলে ?'

'আজকাল ইলেকট্রিক আগুনে লোহা গলানো হয়। যে লোক এই কাজ জানে তাকে মেল্টার বলে। গঙ্গাপদ আমার সর্দার মেল্টার। সে ছুটিতে গেছে বলে আমার একটু অসুবিধে হয়েছে। তার অ্যাসিস্টেন্ট দু'জন আছে বটে, কোনো মতে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। আমাদের দেশে ভাল মেল্টার বেশি নেই, যে দু'চারজন আছে, গঙ্গাপদ তাদের একজন।'

'তাই নাকি ! সে ছুটি নিল কেন ?'

'তার একমাস ছুটি পাওনা হয়েছিল। মনে হচ্ছে যেন বলেছিল ভারত ভ্রমণে যাবে ; আজকাল সব স্পেশাল ট্রেন হয়েছে সারা দেশ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।'

'হ্যাঁ। ওর আত্মীয়স্বজন কেউ আছে ?'

'বোধ হয় না। একলা থাকত।'

'ওর স্বভাব-চরিত্র কেমন ?'

'খুব কাজের লোক। বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। হুঁশিয়ার।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে তাকালেন। ব্যোমকেশ যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, একটু সজাগ হয়ে বলল— 'গঙ্গাপদর কোনো শত্রু আছে কিনা আপনি জানেন ?'

রতনলাল ভুরু তুললেন—'শত্রু ! কই, গঙ্গাপদর শত্রু আছে এমন কথা তো কখনো শুনিনি—ওঃ !'

তিনি হঠাৎ হেসে উঠলেন— 'একজনের সঙ্গে গঙ্গাপদর শত্রুতা হয়েছিল, সে এখন জেলে।'

'তিনি কে ?'

'তার নাম নরেশ মণ্ডল। তিন বছর আমার সর্দার মেল্টার ছিল, গঙ্গাপদ ছিল তার অ্যাসিস্টেন্ট। দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি লেগে থাকত। নরেশ ছিল রাগী, আর গঙ্গাপদ মিটিমিটে বজ্জাত। কিন্তু দু'জনেই সমান কাজের লোক। আমি মজা দেখতাম। তারপর হঠাৎ একদিন নরেশ একজনকে খুন করে বসল। গঙ্গাপদ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। নরেশের জেল হয়ে গেল।'

'খুনের জন্যে জেল ! কতদিনের মেয়াদ জানেন ?'

'ঠিক জানি না। চার পাঁচ বছর হবে। নরেশ জেলে যাবার পর গঙ্গাপদ সর্দার মেল্টার হয়ে বসল।' বলে রতনলাল হো হো শব্দে হাসলেন।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল— 'আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি, এবার উঠি। একটা কথা— গঙ্গাপদকে আপনি শেষবার দেখেছেন কবে ?'

'দিন বারো-চোদ্দ আগে।'

'তখন তার মুখে দাড়ি ছিল ?'

'দাড়ি ! গঙ্গাপদর কস্মিনকালেও দাড়ি ছিল না।'

'ধন্যবাদ।'

রাস্তায় বেরিয়ে রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন— 'অতঃপর ?'

ব্যোমকেশ বলল— 'অতঃপর অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো ছাড়া আর তো কোনো রাস্তা দেখছি না। — এক কাজ করা যেতে পারে। চার পাঁচ বছর আগে নরেশ মণ্ডল খুন করে জেলে গিয়েছিল ; তার বিচারের দলিলপত্র আদালতের দপ্তর থেকে তুমি নিশ্চয় যোগাড় করতে পারবে। অন্তত হাকিমের রায়টা যোগাড় কর। সেটা পড়ে দেখলে হয়তো কিছু হদিস পাওয়া যাবে।'

রাখালবাবু বললেন— 'বেশ, রায় যোগাড় করব। নেই কাজ তো খই ভাজ। কাল সকালে আপনি খবর পাবেন।'

ব্যোমকেশরা প্রায় মাস ছয়েক হলো কেয়াতলার নতুন বাড়িতে এসেছে। বাড়িটি ছোট, কিন্তু দোতলা। নীচে তিনটি ঘর, ওপরে দুটি। সত্যবতী এই বাড়িটি নিয়ে সারাক্ষণ যেন পুতুল খেলা করছে। আনন্দের শেষ নেই ; এটা সাজাচ্ছে, ওটা গোছাচ্ছে, নিজের হাতে ঝাঁট দিচ্ছে, ঝাড়-পোঁছ করছে। ব্যোমকেশ কিন্তু নির্বিকার, শালগ্রামের শোয়া-বসা বোঝা যায় না।

পরদিন বিকেলবেলায় ব্যোমকেশ তার বসবার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল, দেখছিল লাল কোট পরা কোনো লোক চোখে পড়ে কি না। কয়েকটি লাল শাড়ি পরা মহিলা গেলেন, দু' একটি লাল ফ্রক পরা খোকাখুকিকেও দেখা গেল, কিন্তু লাল কোট পরা বয়স্থ পুরুষ একটিও দৃষ্টিগোচর হলো না। অনুমান হয় আজকাল লাল কোট পরে কোনো পুরুষ কলকাতার রাস্তায় বেরোয় না।

এই সময় টেলিফোন বাজল। রাখালবাবু বললেন— 'ব্যোমকেশদা, মামলার রায় পেয়েছি। পড়ে দেখলাম আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন কিছু নেই। পিওনের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি পড়ে দেখুন।'

আধ ঘণ্টা পরে থানা থেকে কনস্টেবল এসে রায় দিয়ে গেল। আলিপুর আদালতের জজ সাহেবের রায়, কড়া সরকারী কাগজে বাজাপ্তা নকল। পনেরো-ষোল পৃষ্ঠা। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরিয়ে পড়তে বসল।

রায়ের আরম্ভে জজ সাহেব ঘটনার বয়ান করেছেন। তারপর সাক্ষী-সাবুদের আলোচনা করে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন। রায়ের সারাংশ এই :

'আসামী নরেশ মণ্ডল, বয়স ৩৯। Scrap Iron & Steel Factory Ltd. নামক লোহার কারখানায় কাজ করে। অপরাধ— রাস্তায় একজন ভিক্ষুককে খুন করিয়াছে। পিনাল কাডের ৩০৪/৩২৩ ধারা অনুযায়ী দায়রা সোপর্দ হইয়াছে।

'প্রধান সাক্ষী গঙ্গাপদ চৌধুরী এবং অন্যান্য সাক্ষীর এজাহার হইতে জানা যায় যে, আসামী অত্যন্ত বদরাগী ও কলহপ্রিয়। ঘটনার দিন বিকাল আন্দাজ পাঁচটার সময় আসামী নরেশ মণ্ডল ও সাক্ষী গঙ্গাপদ চৌধুরী একসঙ্গে কর্মস্থল হইতে বাসায় ফিরিতেছিল। দু'জনে পূর্বোক্ত লোহার কারখানায় কাজ করে, গঙ্গাপদ চৌধুরী নরেশ মণ্ডলের সহকারী।

'পথ চলিতে চলিতে বাজারের ভিতর দিয়া যাইবার সময় নরেশ সামান্য কারণে গঙ্গাপদর সঙ্গে ঝগড়া জুড়িয়া দিল ; তখন গঙ্গাপদ তাহার সঙ্গে সঙ্গে না গিয়া পিছাইয়া গেল ; নরেশ

আগে আগে চলিতে লাগিল, গঙ্গাপদ তাহার বিশ গজ পিছনে রহিল।

'এই সময় একটা কোট-প্যান্ট পরা মাদ্রাজী ভিক্ষুক নরেশের পিছনে লাগিল, ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে নরেশের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভিক্ষুকটার চেহারা জীর্ণ-শীর্ণ, কিন্তু সে ইংরাজিতে কথা বলে। বাজারে অনেকেই তাহাকে চিনিত।

'গঙ্গাপদ তাহাদের পিছনে যাইতে যাইতে দেখিল, নরেশ ক্রুদ্ধভাবে হাত নাড়িয়া তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভিক্ষুক তাহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না। তারপর হঠাৎ নরেশ পাশের দিকে ফিরিয়া ভিক্ষুকের গালে সজোরে একটা চড় মারিল। ভিক্ষুক রাস্তার উপর পড়িয়া গেল। নরেশ আর সেখানে দাঁড়াইল না, গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল।

'গঙ্গাপদ বিশ গজ পিছন হইতে সবই দেখিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিল ভিক্ষুক অনড় পড়িয়া আছে; তারপর তাহার নাড়ি টিপিয়া দেখিল সে মরিয়া গিয়াছে। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় তাহার প্রাণশক্তি বেশি ছিল না, অল্প আঘাতেই মৃত্যু হইয়াছে।

'ইতিমধ্যে আরও অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নরেশকে চড় মারিতে দেখিয়াছিল। তাহারা পুলিসে খবর দিল। পুলিস নরেশের বাসায় গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল।

'পুলিসের পক্ষে এই মামলায় যাহারা সাক্ষী দিয়াছে তাহারা সকলেই নিরপেক্ষ, কেবল গঙ্গাপদ ছাড়া। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে; তাহার বক্তব্য— গঙ্গাপদ তাহার শত্রু, তাহাকে সরাইয়া কর্মক্ষেত্রে তাহার স্থান অধিকার করিতে চায়; তাই সে মিথ্যা মামলা সাজাইয়া তাহাকে ফাঁসাইয়াছে।

'এ কথা সত্য যে সাক্ষী গঙ্গাপদ নিঃস্বার্থ ব্যক্তি নয়; কিন্তু অন্য সাক্ষীদের সঙ্গে তাহার এজাহার মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গঙ্গাপদর সাক্ষ্য মিথ্যা নয়।

'এ অবস্থায় আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য ৩০৪ ধারা অনুসারে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ধার্য হইল।'

ব্যোমকেশের রায় পড়া যখন শেষ হলো তখন সন্ধ্যা নেমেছে, ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ অন্ধকারে চুপ করে বসে রইল, তারপর আলো জ্বেলে টেলিফোন তুলে নিল—

'রাখাল! রায় পড়লাম।'

'কিচ্ছু পেলেন?'

'একটা রাগী মানুষের চরিত্র পেলাম।'

'তাহলে রায় পড়ে কোনো লাভ হলো না?'

'বলা যায় না।— যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার লুকানো রতন।'

'তা বটে।'

'ভাল কথা, পোড়ো বাড়িতে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল তার ফটো নেওয়া হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'গঙ্গাপদ চৌধুরীর পাত্তা পাওয়া যায়নি?'

'না। ভারত ভ্রমণের যত স্পেশাল ট্রেন আছে তাদের অফিসে খোঁজ নিয়েছিলাম কিন্তু গঙ্গাপদ চৌধুরী নামে কোনো যাত্রীর নাম নেই।'

'হুঁ। হয়তো ছদ্মনামে গিয়েছে।'

'কিংবা যায়নি। কলকাতাতেই কোথাও লুকিয়ে বসে আছে।'

'তাও হতে পারে। আর কোনো নতুন খবর আছে?'

'এইমাত্র মীরাট থেকে 'তার' এসেছে। অশোক মাইতি খাঁটি মীরাটের লোক। ওখানে কোনো জাল-জুচ্চুরি নেই।'

'ভাল; আর কিছু।'

'নতুন খবর আর কিছু নেই। এখন কর্তব্য কি বলুন!'

'কর্তব্য কিছু ভেবে পাচ্ছি না। একটা কথা। নরেশের জেলের মেয়াদ এতদিনে ফুরিয়ে আসার কথা, সে জেল থেকে বেরিয়েছে কিনা খবর নিতে পার?'

'পারি। কাল সকালে খবর পাবেন।'

পরদিন বেলা ন'টার সময় রাখালবাবু ব্যোমকেশের কাছে এলেন। মুখ গম্ভীর। বললেন— 'ব্যাপার গুরুতর। দেড়মাস আগে নরেশ মণ্ডল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। জেলে ভাল ছেলে সেজে ছিল তাই কিছু দিনের রেয়াত পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলল— 'হুঁ। জেল থেকে বেরিয়ে সে কোথায় গেছে সন্ধান পেয়েছ?'

'তার পুরোনো বাসায় যায়নি। কারখানাতেও যায়নি, কাল রতনলাল কাপড়িয়ার মুখে তা জানতে পেরেছি। সুতরাং সে ডুব মেরেছে।'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করে থেকে বলল— 'ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হচ্ছে। নরেশের মনে যদি পাপ না থাকবে তাহলে সে ডুব মারবে কেন? সে রতনলালের কাছে গিয়ে চাকরিটা আবার ফিরে পাবার চেষ্টা করত।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'গল্পটা এখন কালানুক্রমে সাজানো যেতে পারে। —নরেশ মণ্ডল রাগী এবং ঝগড়াটে, গঙ্গাপদ মিটমিটে শয়তান। দু'জনে এক কারখানায় কাজ করত; দু'জনের মধ্যে খিটিমিটি লেগেই থাকত। গঙ্গাপদর মতলব নরেশকে সরিয়ে নিজে তার জায়গায় বসবে। কিন্তু নরেশকে সরানো সহজ নয়, সে কাজের লোক।

'হঠাৎ গঙ্গাপদ সুযোগ পেয়ে গেল। নরেশ রাস্তায় একটা ভিখিরিকে চড় মেরে শেষ করে দিল। আর যায় কোথায়! গঙ্গাপদ নরেশকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল।

'নরেশের কিন্তু ফাঁসি হলো না। সে দোষী সাব্যস্ত হলেও তার তিন বছর কারাদণ্ড হলো। গঙ্গাপদর পক্ষে একটা মন্দের ভাল, সে কারখানায় সর্দার মেল্টার হয়ে বসল। নরেশ জেলে গেল।

'নরেশ লোকটা শুধু বদমেজাজী নয়, সে মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখে। জেলে যাবার সময় সে বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছিল, গঙ্গাপদকে খুন করে প্রতিহিংসা সাধন করবে। তিন বছর ধরে সে এই প্রতিহিংসার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে।

'গঙ্গাপদ জানত নরেশের তিন বছরের জেল হয়েছে, সে তক্কেতক্কে ছিল। তাই নরেশ যখন মেয়াদ ফুরবার আগেই জেল থেকে বেরুল, গঙ্গাপদ জানতে পারল। তার প্রাণে ভয় ঢুকল। হয়তো সে দেখেছিল নরেশ তার বাসার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা সামনের পোড়ো বাড়ি থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। গঙ্গাপদ ঠিক করল কিছুদিনের জন্যে বাসা থেকে উধাও হবে।

'সে কারখানা থেকে একমাসের ছুটি নিল এবং একটা দাড়ি যোগাড় করে তাই পরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যাতে নরেশ তাকে দেখলেও চিনতে না পারে। গঙ্গাপদ বোধহয় সত্যিই

ভারত ভ্রমণে যাবার মতলব করেছিল, তারপর হঠাৎ একদিন হাওড়া স্টেশনে অশোক মাইতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে দেখল অশোক মাইতির চেহারা অনেকটা তার নিজের মত।

'গঙ্গাপদ লোকটা মহা ধূর্ত। তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, অশোক মাইতিকে যদি কোনোমতে নিজের বাসায় এনে তুলতে পারে তাহলে নরেশ ভুল করে তাকেই খুন করবে এবং ভাববে, গঙ্গাপদকে খুন করেছে। গঙ্গাপদ নিরাপদ হবে, তাকে আর প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। চাকরিটা অবশ্য যাবে ; কিন্তু প্রাণ আগে, না চাকরি আগে ? গঙ্গাপদ নিশ্চয় বুঝেছিল যে, নরেশ তাকে সামনের জানলা থেকে গুলি করে মারবে।

'এবার নরেশের দিকটা ভেবে দেখা যাক। নরেশ জেল থেকে বেরিয়ে একটা পিস্তল যোগাড় করেছিল। পুরোনো বাসায় ফিরে যাবার কোনো মানে হয় না, সে অন্য কোথাও আড্ডা গেড়েছিল এবং গঙ্গাপদর বাসার সামনে পোড়ো বাড়িটায় যাতায়াত করেছিল। তার বোধ হয় মতলব ছিল গঙ্গাপদ কখনো তার জানলা খুলে দাঁড়ালে সে রাস্তার ওপার থেকে তাকে গুলি করে মারবে, তারপর কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। গঙ্গাপদ খুন হবার পর কলকাতা শহর আর তার পক্ষে নিরাপদ নয়, পুলিস তাকে সন্দেহ করতে পারে।

'যাহোক, গঙ্গাপদ অশোক মাইতিকে নিজের বাসায় বসিয়ে লোপাট হলো। অশোক মাইতিকে উপদেশ দিয়ে গেল, সে যেন মাঝে মাঝে জানলা খুলে লক্ষ্য করে, রাস্তা দিয়ে লাল কোট পরা কেউ যায় কি না। লাল কোট পরা মানুষটা নিছক কল্পনা ; আসল উদ্দেশ্য অশোক মাইতি জানলা খুলে দাঁড়াবে এবং নরেশ সামনের জানলা থেকে তাকে গুলি করবে।

'সবই ঠিক হয়েছিল কিন্তু একটা চুক হয়ে গেল ; অশোক মাইতি আহত হলো, মরল না। সে পুলিসকে সব ঘটনা বলল। এখন গঙ্গাপদ আর নরেশ দু'জনের অবস্থাই সমান, ওরা কেউ আর আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। খবরের কাগজে সংবাদ ছাপা হয়েছে, দু'জনকেই পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'নরেশ অবশ্য আইনত অপরাধী, সে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গঙ্গাপদ লোকটা মহা পাষণ্ড ; জেনেশুনে সে একজন নিরীহ লোককে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু সে যদি ধরাও পড়ে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে কি না সন্দেহ।'

ব্যোমকেশ চুপ করল। রাখালবাবুও নীরবে কিছুক্ষণ টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁকজোক কেটে বললেন— 'তা যেন হলো। কিন্তু যাকে আইনত শাস্তি দেওয়া যাবে তাকে ধরবার উপায় কি বলুন !'

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ব্যোমকেশ বলল— 'একমাত্র উপায়— বিজ্ঞাপন।'

'বিজ্ঞাপন !'

'হ্যাঁ। —পুকুরে ছিপ ফেলে বসে থাকা। মাছ যদি টোপ গেলে তবেই তাকে ধরা যাবে।'

তিন দিন পরে কলকাতার দুইটি প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরুল :

বম্বে স্টীল ফাউণ্ড্রি লিমিটেড—

আমাদের বম্বের কারখানার জন্য অভিজ্ঞ ইলেকট্রিক মেণ্টার চাই।

বেতন— ৭০০-২৫-১০০০ ।

প্রশংসাপত্র সহ দেখা করুন।

গড়িয়াহাট বাজারের কাছে রাস্তার উপর একটি ঘর, তার মাথার উপর সাইনবোর্ড ঝুলছে— বম্বে স্টীল ফাউণ্ড্রি লিমিটেড (ব্রাঞ্চ অফিস)।

ঘরের মধ্যে একটি টেবিলের সামনে রাখালবাবু বসে আছেন, তাঁর পরিধানে সাদা কাপড়চোপড়। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে নথিপত্র দেখছেন। অদূরে অন্য একটি ছোট টেবিলে ব্যোমকেশ টাইপরাইটার নিয়ে বসেছে। ঘরের দোরের কাছে তকমা-আঁটা একজন বেয়ারা। আর যারা আছে তারা প্রচ্ছন্নভাবে এদিকে ওদিকে আছে, তাদের দেখা যায় না।

প্রথম দিন ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস ঘরে বসে রইলেন, কোনো চাকরি-প্রার্থী দেখা করতে এল না। পাঁচটার সময় ঘরের দোরে তালা লাগাতে লাগাতে রাখালবাবু বললেন— 'বিজ্ঞাপন চালিয়ে যেতে হবে।'

পরদিন একটা লোক দেখা করতে এল। রোগা-পটকা লোক, এক চড়ে মানুষ মেরে ফেলবে এমন চেহারা নয়। তার প্রশংসাপত্র দেখে জানা গেল, তার নাম প্রফুল্ল দে, সে একজন ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী। ইলেকট্রিক মেল্টারের কাজ সে কখনো করেনি বটে, কিন্তু সুযোগ পেলে চেষ্টা করতে রাজী আছে। রাখালবাবু তার নাম-ধাম লিখে নিয়ে মিষ্টি কথায় বিদায় দিলেন।

তৃতীয় দিন তৃতীয় প্রহরে একটি লোক দেখা করতে এল। তাকে দেখেই রাখালবাবুর শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে উঠল। মজবুত হাড়-চওড়া শরীর, গায়ের রং কালো, চোখের কোণে একটু রক্তিমাভা ; গায়ে খাকি কোট, মাথায় চুল ক্রু-কাট করে ছাঁটা। সে সতর্কভাবে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে ঘরে ঢুকল। রাখালবাবুর টেবিলের সামনে দঁড়িয়ে ধরা-ধরা গলায় বলল— 'বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি।'

'বসুন।'

লোকটি সন্তর্পণে সামনের চেয়ারে বসল, একবার ব্যোমকেশের দিকে তীক্ষ্ণ সতর্ক চোখ ফেরাল। রাখালবাবু সহজ সুরে বললেন— 'ইলেকট্রিক মেল্টারের কাজের জন্য এসেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'সার্টিফিকেট এনেছেন ?'

লোকটি খানিক চুপ করে থেকে বলল— 'আমার সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। তিন বছর অসুখে ভুগেছি, কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তারপর— সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছি।'

'আগে কোথায় কাজ করতেন ?'

'নাগপুরে একটা আয়রন ফাউন্ড্রি আছে, সেখানে কাজ করতাম। —দেখুন, আমি সত্যিই ইলেকট্রিক মেল্টারের কাজ জানি। বিশ্বাস না হয় আমি নিজের খরচে বম্বে গিয়ে তা প্রমাণ করে দিতে পারি।'

রাখালবাবু লোকটিকে ভাল করে দেখলেন, তারপর বললেন— 'সে কথা মন্দ নয়। কিন্তু আমাদের এটা ব্রাঞ্চ অফিস, সবেমাত্র খোলা হয়েছে। আমি নিজের দায়িত্বে কিছু করতে পারি না। তবে এক কাজ করা যেতে পারে। আমি আজ বম্বেতে হেড অফিসে 'তার' করব, কাল বিকেল নাগাদ উত্তর পাব। আপনি কাল এই সময়ে যদি আসেন—'

'আসব, নিশ্চয় আসব।' লোকটি উঠে দাঁড়াল।

রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'বক্সী, ভদ্রলোকের নাম আর ঠিকানা লিখে নাও।'

ব্যোমকেশ বলল— 'আজ্ঞে।'

নাম আর ঠিকানা দিতে হবে শুনে লোকটি একটু থতিয়ে গেল, তারপর বলল— 'আমার নাম নৃসিংহ মল্লিক। ঠিকানা ১৭ নম্বর কুঞ্জ মিস্ত্রী লেন।'

ব্যোমকেশ নাম ঠিকানা লিখে নিল। ইতিমধ্যে রাখালবাবু টেবিলের তলায় একটি গুপ্ত

বোতাম টিপেছিলেন, বাইরে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে খবর গিয়েছিল যে, ঘর থেকে যে ব্যক্তি বেরুবে তাকে অনুসরণ করতে হবে। রাখালবাবু নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন যে, এই ব্যক্তিই নরেশ মণ্ডল। কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করার আগে তার বাসার ঠিকানা পাকাভাবে জানা দরকার। সেখানে বন্দুক পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু কিছুই প্রয়োজন হলো না।

নরেশ দোরের দিকে পা বাড়িয়েছে এমন সময় আর একটি লোক ঘরে প্রবেশ করল। নবাগতকে চিনতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না, একেবারে অশোক মাইতির যমজ ভাই। সুতরাং গঙ্গাপদ চৌধুরী। আজ আর তার মুখে দাড়ি নেই।

গঙ্গাপদ নরেশকে দেখার আগেই নরেশ গঙ্গাপদকে দেখেছিল ; বাঘের মত চাপা গর্জন তার গলা থেকে বেরিয়ে এল, তারপর সে গঙ্গাপদর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। দু'হাতে তার গলা টিপে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলতে লাগল— 'পেয়েছি তোকে ! শালা— শূয়ার কা বাচ্চা— আর যাবি কোথায় !'

রাখালবাবু দ্রুত পকেট থেকে বাঁশি বার করে বাজালেন। আরদালি এবং আর যেসব পুলিসের লোক আনাচে-কানাচে ছিল তারা ছুটে এল। গলা টিপুনি খেয়ে গঙ্গাপদর তখন জিভ বেরিয়ে পড়েছে। সকলে মিলে টানাটানি করে নরেশ আর গঙ্গাপদকে আলাদা করল। রাখালবাবু নরেশের হাতে হাতকড়া পরালেন। বললেন— 'নরেশ মণ্ডল, গঙ্গাপদ চৌধুরীকে খুনের চেষ্টার অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো।'

নরেশ মণ্ডল রাখালবাবুর কথা শুনতেই পেল না, গঙ্গাপদর পানে আরক্ত চক্ষু মেলে গজরাতে লাগল— 'হারামজাদা বেইমান, তোর বুক চিরে রক্ত পান করব—'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ বসেছিল, চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি।' সে এখন টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরাল।

রাখালবাবু তাঁর একজন সহকর্মীকে বললেন— 'ধীরেন, এই নাও নরেশ মণ্ডলের ঠিকানা। ওর ঘর খানাতল্লাশ কর। সম্ভবত একটা রিভলবার কিংবা পিস্তল পাবে।— আমরা এদের দু'জনকে লক-আপ-এ নিয়ে যাচ্ছি।'

গঙ্গাপদ মেঝেয় বসে গলায় হাত বুলোচ্ছিল, চমকে উঠে বলল— 'আমাকে লক-আপ-এ রাখবেন। আমি কী অপরাধ করেছি ?'

রাখালবাবু বললেন— 'তুমি অশোক মাইতিকে খুন করাবার চেষ্টা করেছিলে। তোমার অপরাধ পিনাল কোডের কোন দফায় পড়ে পাবলিক প্রসিকিউটার তা স্থির করবেন। ওঠো এখন।'

সন্ধ্যের পর ব্যোমকেশের বসবার ঘরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে রাখালবাবু বললেন— 'আচ্ছা ব্যোমকেশদা, নরেশ মণ্ডল আর গঙ্গাপদ চৌধুরী— দু'জনেই চাকরির খোঁজে আসবে আপনি আশা করেছিলেন ?'

ব্যোমকেশ বলল— 'আশা করিনি, তবে সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে ছিল। কিন্তু ওরা যে একই সময়ে এসে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ শুরু করে দেবে তা কল্পনা করিনি। ভালই হলো, একই ছিপে জোড়ামাছ উঠল।— নরেশ মণ্ডলের ঘরখানা তল্লাশ করে কী পেলে ?'

'পিস্তল পাওয়া গেছে। ওর বিরুদ্ধে মামলা পাকা হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক গঙ্গাপদকে পাকড়ানো যায় কি না। তাকে হাজতে রেখেছি, আর কিছু না হোক, কয়েকদিন হাজত-বাস করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক।'

'হুঁ। অশোক মাইতির খবর কি ?'

'সে এখনো হাসপাতাল থেকে বেরোয়নি। বেরুলেও তাকে এখন কলকাতায় থাকতে হবে। সে আমাদের প্রধান সাক্ষী।

ব্যোমকেশ হঠাৎ হেসে উঠল, বলল— 'কথায় বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। অশোক মাইতি খুব বেঁচে গেছে। ও না বাঁচলে এমন রহস্যটা রহস্যই থেকে যেত।'